বাংলার ভাওয়াইয়া গান

বেণু দত্ত রায়

লিখিত সাহিত্যের পাশাপাশি একটি জীবিতজাতির মৌখিক সাহিত্যও (Oral literature) বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকে। লিখিত সাহিত্য শিক্ষিত মানুষের সৃষ্টি। তার মধ্যে জাতির মার্জিত মানসিকতা, বুদ্ধির দীপ্তি, পরিশীলিত বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ দেখা দেয়। মৌখিক সাহিত্য কিন্তু অধিকতর অর্থে কোনও জাতির মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য, তার হৃদয়রহস্য—এক কথায় তার সমগ্র লোকায়ত জীবনের মন্থনরসজাত সৃষ্টি। তা অবশ্যই পরিশীলিত ও সুমার্জিত মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ নয়, তা কিছু পরিমাণে স্থূল, কেননা তার সৃষ্টিমূলে থাকে সাধারণের মানসমর্জির সুর। তাই লোকসাহিত্য বলে যা কথিত, তা অধিকতর অর্থে কোনও জাতির প্রাণের সৃষ্টি। এ জন্যই কোনও জাতির সাহিত্যের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার কালে লিখিত সাহিত্যের পাশাপাশি থাকে তার লোকসাহিত্যেরও বিবরণ এবং বিশ্লেষণ।

বাঙালির সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে গিয়ে দেখা যায়, তার সূচনাই ঘটেছে গানে। হয়ত ভক্তিরসের ঐকান্তিকতা থেকেই তার সৃষ্টি, দেব মাহাত্ম্য ঘোষণাই ছিল মুখ্যবিষয়। ধর্মচেতনাকে বাদ দিয়ে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য রচিত হয়নি। কিন্তু একটি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ করবার যে, এ-সাহিত্য মূলত গীতধর্মী। বাঙালি মূলত গানের জাতি। তার আবেগপ্রবণতা থেকেই এই সব গানগুলির সৃষ্টি হয়েছে। সাহিত্যের ইতিহাসে লিখিত গানগুলির পাশে পাশে মৌখিক সাহিত্যধারায় লোকায়ত সঙ্গীতগুলিও বিশেষ মূল্যবান। লোকসাহিত্য গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এই গানগুলির সাহিত্যমূল্য নিয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা করেছেন। এই গানগুলির মধ্যে যে-সরলতা, সরসতা, সজীবতা, প্রকাশভঙ্গির কৌশল, ভাষাভঙ্গির আন্তরিকতা আছে, সেগুলির দিকে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। দেশবিভাগ পূর্ব বাংলাদেশের নদীপথে ভ্রমণকালে তিনি যেমন এগুলি শুনেছেন, তেমনই বাংলার নানা অঞ্চলে গীত গানগুলি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের উপরেও গুত্ব দিয়েছেন। পূর্ববাংলায় যেমন এ জাতীয় অজস্র লোকসঙ্গীতের নিদর্শন আছে, তেমনই বাংলার অন্যান্য প্রান্তেও নানাশ্রেণীর গানের সন্ধান পাওয়া যায়। উত্তরবাংলার লোকসাহিত্য ও লোকসঙ্গীতগুলিও তেমনই বাঙালির প্রাণের ঐর্য বিস্তারের পরিচয় দেয়।

এই শ্রেণীর গানের মধ্যে উত্তরবাংলার জলপাইগুড়ি-কোচবিহার বা সন্নিহিত গোয়ালপাড়ার ভাওয়াইয়া গানগুলি বাঙালি চিত্তের এক আশর্চ্য প্রাণস্পন্দনের পরিচয় দেয়। এগুলি এক আশর্চ্য শিল্প। কণ মধুর দুঃখের পদাবলিগুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে বসে কবি জীবনানন্দের সেই আশর্চ্য শুদ্ধ কলি মনে পড়ে, "কে হায় হৃদয়খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে?" আমার তো মনে হয়, ভাওয়াইয়ার গানই সেই বেদনার সুর যে ভিতর থেকে হৃদয় খুঁড়ে দিতে ভালবাসে। আসলে সব ভালবাসাই তো বেদনার গান। সব গানই তো অন্তর বেদনা থেকে বাইরে এসে দাঁড়ায়। পৃথিবীর সব গানই বঁাধা হয়েছে বেদনার কণতম শিল্পে। মনে মনে আমি প্রশ্ন করে উঠি, উত্তরবাংলার এই গানগুলি কি কেউ মুখেমুখে বেঁধেছিলেন? অথবা হৃদয়ের আঁকুপাকু করা আবেগ-উত্তাপে প্রাকৃতিক নির্যাসের মতোই নিঃসৃত হয়েছিল তাদের কণ্ঠ থেকে? নদীর চরে, খোলা মাঠে, মুক্ত দিগন্তের অঙ্গনে মোষ চরাতে এসে, অথবা খোলা আকাশের তলায় সাদা কাশিয়ার বনে, নলখাগড়া ঝোপের ধারে-ধারে এইসব গান একদিন জীবনের উত্তাপের মতো বিকীর্ণ হয়েছিল। এই গানগুলি কত সরল ও সুন্দর, কত সহজ ও অনায়াস, কত নিষ্পাপ ও শুদ্ধ, একমাত্র গান শুনলেই তা অনুভব করা যায়।

লোকায়ত জীবনের শিল্পগুলি আধুনিকতার স্পর্শে ইতিমধ্যেই অনেকটা ম্লান। আমরা সেই পটভূমি থেকে সরে এসেছি বলে আজ লোকসঙ্গীতের সৃষ্টিও হচ্ছে বৈদ্যুতিক আলোর ঝলমলানো মঞ্চে। নগরীর মার্জিত মানুষদের অনুষ্ঠানে আজ

যখন ভাওয়াইয়া গান শুনি তখন গদাধরের তীরের সেই শিল্পিতকণ্ঠের অপূর্ব মাদকতা আর হৃদয়কে মুগ্ধ করে না। কৃত্রিমতা আজ আমাদের জীবনের অঙ্গ বলে শিল্পের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কৃত্রিমতা প্রাধান্য লাভ করেছে।

ভাওয়াইয়াকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশ করাই আমার লক্ষ্য। ভাওয়াইয়ার গবেষক আমি নই। এ-সম্পর্কে নতুন কোনও মত বা তত্ত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্য নিয়েও আমার কলম ধরা নয়। সে-কাজ বহুকাল ধরে পূর্ববর্তী আচার্য বা পণ্ডিতেরা করে গিয়েছেন। ভাওয়াইয়া শীর্ষক গবেষণাগ্রন্থে অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে কিছুকাল আগে সে-কাজ শ্রদ্ধেয় ড. সুখবিলাস বর্মা সম্পন্নকরেছেন। রসাস্বাদনের আনন্দই আমাকে ভাওয়াইয়া গানগুলির উপরে পুনরপি লেখার প্রেরণা দিয়েছে। এই গানগুলির বৈচিত্র ও বৈভবেরই আমি পূজারি। এই সব অগণিত অসংখ্য গান বাস্তবিক পক্ষেই বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। ময়মনসিংহ গীতিকা বা পূর্ববঙ্গগীতিকাগুলি যেমন আজ সাহিত্য হিসাবে প্রাণদ প্রবর্তনার পরিচয়বাহী; আমি মনে করি, ভাওয়াইয়া সঙ্গীতগুলিও তেমনই বাঙালি প্রাণের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়-রূপে সংকলনবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। নানাজনের বিচ্ছিন্ন প্রয়াসে কিছু কিছু সংগৃহীত হয়ে নানা গ্রন্থে ছড়িয়ে থাকলেও এগুলি সংগৃহীত হয়ে গ্রন্থবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। নিঃসংশয়ে এগুলি আঞ্চলিক, এবং আঞ্চলিক বৈচিত্রই তো লোকসঙ্গীতের প্রাণ। তবুও এই আঞ্চলিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি ভাওয়াইয়া। মানবসমাজের চিরন্তন প্রাণের রস-রহস্যেই তা পরিপূর্ণ। এগুলির মধ্যে আছে চিরকালের মানুষের হৃদয়সম্পদ। আমি কোনও গায়কি, আঞ্চলিক স্বরভেদ, ছন্দ বা বাগভঙ্গির কথা বলছি না, আঞ্চলিক সাহিত্যের সে-সব বিশিষ্ট লক্ষণ অবশ্যই থাকে, কিন্তু একটি জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস-স্পন্দন-প্রত্যয় তথা জীবনের আবেগে যে সরলতা থাকে, তার সাহায্যে তা যে কোনও ভৌগোলিক সীমাকে পেরিয়ে নিত্যকালের সম্পদরূপে গণ্য হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে সুখবিলাস বর্মা-কৃত "ভাওয়াইয়া" গ্রন্থটি থেকে ভাওয়াইয়া গানের জনপ্রিয় শিল্পী ও বাঙালির প্রাণের মানুষ আববাসউদ্দীন সাহেব ও অন্য এক লোকায়ত জীবনের সুপ্রসিদ্ধ গবেষক ড. সুধীরকুমার করণের বক্তব্যদুটি উদ্ধার করে আমি আমার বক্তব্যকে সমর্থন করতে চাই।

আববাসউদ্দীন বলেছেন, "এই গানের সুরে সত্যিকারের উদাস করা ভাব সারাবাংলার অন্তরবাণীর তারে এক অভূতপূর্ব স্পন্দন তুলেছে। কারণ এ শুধু কল্পনাবিলাস নয় এ হচ্ছে মানবহৃদয়ের চিরন্তন সত্যের প্রতিচ্ছবি।"

ড. করণ বলেছেন, "যে গানে লোকসমাজের বৃহদংশ একাত্ম, যে-গান সবাই গাইতে পারে অনায়াস ভঙ্গিমায়, যে গান অনায়াসে যে কোন লোকের দ্বারা রচিত হতে পারে .... তা স্বমহিমায় উজ্জ্বল। .... উত্তরবঙ্গের রাজবংশী অধ্যুষিত অঞ্চলের ভাওয়াইয়া-চট্‌কা গান অবশ্যই বাংলার লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে এক অনন্য ও অসাধারণ সঙ্গীত।"

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছেন, বাঙালি চরিত্রের প্রধান অবলম্বন হচ্ছে মধুর রস। এই মধুর রসের মধুরিমা মাখিয়ে বাঙালির বৈষ্ণব পদাবলিতে এসেছে নরনারীর প্রেম ভালবাসা, মান-অভিমান ইত্যাদি। আবার তার পাশাপাশিই শাক্তপদাবলির বাৎসল্য রসের ধারা বয়ে গিয়েছে। এই বাৎসল্য রস বাঙালি মায়ের ঐকান্তিকতা দিয়ে মাখানো। বৈষ্ণবপদাবলিতেও আছেন মাতা যশোদা। প্রিয় সন্তানের জন্য উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা তাঁর সীমাহীন।

কিছুকাল আগে সে-কাজ শ্রদ্ধেয় ড. সুখবিলাস বর্মা সম্পন্ন ধর্মীয় গানের কথা বাদই দিচ্ছি, চিরন্তন বাৎসল্যরসের পরিবেষণে ভাওয়াইয়া গানও সাধারণ লোকজীবনের মাতা ও কন্যার সম্পর্ককে কত সফলভাবেই না প্রকাশ করেছে। নীচের পদটির দিকে লক্ষ কন, এক দুঃখিনী কন্যা কাককে উদ্দেশ করে জানিয়েছে যে শ্বশুরবাড়িতে তার দুঃখময় জীবনযাপনের কথা যেন সে তার মায়ের কাছে পৌঁছে দেয় —

ও মোর কাগারে কাগা,
যখন মাও মোর রান্দে বাড়ে পত্র না দেন কাগা মায়ের হস্তে মইরবে মাও মোর আগুনতং পড়িয়া রে।।
ও মোর কাগারে কাগা—
যখন মাও মোর আঙ্গা কোটে, পত্র না দেন মায়ের হস্তে মইর্‌বে মাও মোর গালাত্ কাটারি দিয়া রে।।

মাতা ও কন্যাকে আশ্রয় করে অজ্ঞাতপরিচয় রাজবংশী বাঙালি কবি যে মাধুর্যপ্রকাশ করেছেন, তা একান্তভাবেই সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ। লোকসাহিত্যের ভাষার সারল্য প্রাণ থেকে প্রাণের মধ্যে ধারাটি ছড়িয়ে দেয়। এর আছে নিজস্ব ভাষা, যা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ভাষা থেকে আলাদা। তা শুধু সংবাদ দেয় না, সঙ্গীত ছড়ায়।

কন্যার চোখের জলে ভিজে নীচের গানটি তার অভিমানভরা হৃদয়কে এক আশ্চর্য ব্যঞ্জনায় ভরে দিয়েছে—

তিস্তার পারের কন্যা তুমি হে,
কন্যা ছাড়লেন তিস্তার মায়া।
বাপ মাও দূরদেশে তোমাকে খাইছে বেছাইয়া।
এই কণরসের আবেদন চারপাশের প্রকৃতির সাযুজ্যে এক অপরূপতা লাভ করে উঠেছে—
কুরা কান্দে কুরী কান্দে কান্দে বালিহাঁস,
কান্দে ঐ না তিস্তার পারে
প্রভাতে চকোয়া কান্দে ঐ না বালির চরে।

এই অপরূপত্বের বাহন হয়েছে রাজবংশীভাষা। লোককবির গানের আস্বাদনের জন্য উপমা-অলঙ্করণের জটিলতা সরাব ার প্রয়োজন হয় না। একান্ত ভাবেই এগুলি মানসিক সম্পদে পরিপূর্ণ। রাজবংশী সম্প্রদায় বাঙালি সমাজেরই শাখা বলে তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবমণ্ডল আমাদের অপরিচিত নয়।

একটি বিবাহিত মেয়ের প্রাণ বাপ-মায়ের জন্য কেঁদে উঠেছে। ছইওয়ালা গাড়িয়ালকে ডেকে সে তার প্রাণের কথা নিবেদন করে। সে বলে, আমার বাবা-মা বিয়ের পর আর কোনও খবর করেনি। হে গাড়িয়াল ভাই, তোমার পায়ে পড়ি, আমার বাবা-মা কেমন আছে—
ও গাড়িয়ালভাই পাও ধরং
একখানা কাথা জিগাসা করং
কেমন আছে মোর দয়াল বাপ-মাও।
বাপো-মা মোর কঠোর হিয়া
মন বান্দিছে পাষাণ দিয়া
বেছায়াখায়া মোর খবর না করে।

অধ্যাপিকা ভাস্বতী রায়চৌধুরী এক প্রবন্ধে বলেছেন, ‘‘যে-প্রেম ও বিরহের কথা আছে ভাওয়াইয়া গানে—সেই প্রেম মেয়েদেরই হৃদয়ের ভাষা, মেয়েদেরই মুখের ভাষা।’’ এর সপক্ষে বলতে গিয়ে তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে, মাতৃতান্ত্রিক সম াজব্যবস্থার প্রভাবেই হয়ত এই অঞ্চলে মেয়েরা ছিল অনেকটাই স্বাধীন। তাই তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলতে পেরেছে তাদের প্রেমের কথা, বিরহের কথা। আবার অধ্যাপক ড. হরিপদ চত্রবর্তীও বলেছেন ‘ভাওয়াইয়া প্রেমের গান। আরও তীক্ষ্মভাবে দেখলে বলা যায়, প্রোষিতভর্তৃকার গান বা বিপ্রলব্ধ শৃঙ্গার রসের গান। নারীর বিরহব্যাকুলতাই এই গানের মর্মবাণী, ন ায়ক কোথাও সাধু, নাবিক, মইষাল বন্ধু, মাহুত বন্ধু, কোথাও বা রাখাল, কোথাও বা বৈদ্য। যৌবনবেদনার প্রকাশ ঋজু।’’ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যও বলেছেন, ‘‘ভাটিয়ালী সুরে দেহতত্ত্ব, বাউল, বৈরাগ্যমূলক গান গাওয়া হয়। কিন্তু ভাওয়াইয়া গানে কেবলমাত্র নারীহৃদয়ের বেদনার অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়।’’ ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক কিন্তু এই মূল ভাবনাকে স্বীকৃতি জা নিয়েই আরও অনেক কাল আগে লিখেছিলেন, ‘‘নারীর বিরহবেদনা প্রকাশের অধিকার নেই। সে ব্যথাবেদনা প্রকাশের পরোক্ষ পথ হয়েছে পুষের কণ্ঠ।’’ মধ্যযুগীয় শিষ্ট সাহিত্যের প্রভাবও তিনি এর মধ্যে দেখেছেন। তাঁর মনে হয়েছে, এর মধ্যে এক দিকে এসেছে বৈষ্ণব পদসাহিত্যের প্রভাব, অন্য দিকে নারীর বেদনাকে প্রকাশের পরোক্ষ রীতি; নারী নিজে নয়, পুষ তার প্রকাশক।

সাধারণভাবে রাধাকৃষ্ণ ভাবনাতেই বেশির ভাগ সমালোচক আপ্লুত হয়েছেন। এর কারণও এই যে, সাধারণ ভাবে তাঁরা অনেকেই লোকসঙ্গীতের ত্নন্দ্বজন্দ্রস্জপ্নন্দ্বস্তন্দ্ব এর সঙ্গে সংযুক্ত নন। ড. বর্মা স্পষ্টই বলেছেন, ‘‘প্রেম অপার্থিব অলৌকিক স্বর্গীয় বিস্ময় নয় ভাওয়াইয়া গবেষকের কাছে। বরং কঠিন কর্মমুখর জীবনের কেন্দ্রভূমিতে এর অবস্থান। প্রকৃতির নিবিড় দা ক্ষিণ্যে, অখণ্ড নির্জনতার মধ্যে নায়িকার সঙ্গে নায়কের সাক্ষাৎ হয় অল্পক্ষণের জন্য। পরস্পর পরস্পরের বোঝাবুঝির মধ্য দিয়ে শ্রমসাধ্য কর্মক্লান্তির মধ্যেও পরশমণির মতো প্রেমের ছোঁয়া লাগে। দৈনন্দিন জীবনাবরণের সমস্ত ক্লেশ মুহূর্তে দূর হয়ে যায়। নারী অনুভব করে যে, এই সহমর্মী পুষটি সঙ্গে থাকলে সে যে-কোনো কষ্টসাধ্য পূর্ববঙ্গের লোকসঙ্গ ীতগুলির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে এখানে জীবনঘনিষ্ঠতা অনেক বেশি। নদী-জল আকাশ-বাতাস, গর বাথান, নদীর চর, চিলামারীর বন্দর সব গভীর ও অন্তরঙ্গ বাস্তবমুখী হয়ে ধরা দিয়েছে। আমার বত্তব্য ভাওয়াইয়া গানের প্রধান

পরিচয় এর কবিত্বে, এবং এগুলির একনিষ্ঠ সরলতায়। চর্যাপদগুলি ধর্মীয় বিষয় হওয়া সত্ত্বেও যদি সাহিত্যের মর্যাদা পেয়ে থাকে, গীতিকারূপে পরিচিত ময়মনসিংহ গীতিকাকে যদি আমরা সাহিত্যের অঙ্গীভূত করে থাকতে পারি, তবে উত্তরবাংলার এই লোকসঙ্গীতগুলিও সাহিত্য হিসাবে গণ্য হওয়ার যোগ্য।

সব দেশের লোকসঙ্গীতেই প্রকৃতির এক পটভূমি থাকে। সেই দেশের নদী-খাল-সাগর-হাওয়া, বনজঙ্গল, পাহাড়-উপত্যকা, নানা রঙের পাখিপাখালি সেই পরিবেশ রচনা করে। উত্তরবাংলার এইসব গানগুলিতেও প্রকৃতি এক নিবিড় অনুষঙ্গ রচনা করেছে। এগুলি সৃষ্টি করেছে রূপের মায়া। ভরা তিস্তা ছুটে চলেছে গাভুর নারীর মতো, ছিট্‌কে পড়ছে ফেনার ফুল, যেন সাদা নাকছাবি তার নাকে। ঘোলা জলের নদীর তীরের আলুয়া-কাশিয়ার বন। চরের ধারে ধারে নতুন সবুজ ঘাস। তোর্সা নদীরও সেই একই চেহারা, বনের আবাদ তার পাশে। হলং নদীর জল নীচের শৈবালাচ্ছন্ন পাথরের জন্য সবুজ হয়ে থাকে। এইসব নদীগুলি—গদাধর, সুটুঙ্গা, মান্‌সাই, ধরলা নদীর তীরে তীরে মোষ চরাতে আসে রাখালরা, উত্তরবাংলার রাজবংশী ভাষায় যারা মৈষাল নামে পরিচিত। মোষ চরানোই তাদের কাজ। মোষের গলায় পেতলের ঘন্টি বাজে—ঢং ঢং ঢং।

বাথান শব্দ এসেছে বিশিষ্ট অর্থে গর বাসস্থান হিসাবে। ডাঙা-অঞ্চলে বা নদীর চরে মোষ বা গ রাখা হয় যেখানে। এইসব স্থান থেকেই বাথানের মালিকেরা দুধ-দই-ঘি-মাখন যোগাত। জি-রোজগারের জন্য এদের মোষ চরাত মৈষালেরা। মোষের পিঠে বসে থাকত ওরা। মোষ চরিয়ে জীবিকা অর্জনের স্বার্থে গ্রামে-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াত। ঘর ছিল না তাদের, কিন্তু তাদের জীবনে ছিল এক রকম ভালবাসার রেশ। কোথাও কোনওখানে কোনও নারীর সঙ্গে জমে উঠত অবৈধ প্রেম-প্রণয়। সুতরাং সে-প্রেমের স্থায়িত্ব নেই। এই মৈষাল-প্রেমিকদের দূরে যেতে হয় বলে তাদের ছেড়ে দিতে আকুলপ্রাণ নারীরা। কোথা থেকে কবে এসেছিল, তারা চলে যাবে। পরপুষদের জন্য নারীর প্রেম এইসব গানে জীবন্ত। আর সেইসব হৃদয়ভাঙা অবৈধপ্রেমের গানে সাড়া দিতে উড়ে আসে গদাধর নদীর তীরের বগা, কোরা ইত্যাদি পাখি। কোথাও বা চিলামারীর বন্দরের তোতা-ময়না-বগিলা-দৈয়ল ও টিটি পাখির দল।

এইসব প্রকৃতিকে আশ্রয় করে চিরকালের অবৈধ বা নিষিদ্ধ প্রেম রূপ ধরে। সব দেশে সব কালে অগম্যাগমন বা নিষেধ-বিধিভাঙা প্রেমের জয়গান। এগুলিতেও তাই। বিচিকলা যেমন কলা নয়, তেমনই পরপুষের সঙ্গে প্রেমও অর্থহীন। এ-প্রেম ঘর বাঁধে না, ঘর ভাঙায়। পরপুষের জন্য এই প্রেমে লজ্জার বাঁধন মানে না নায়িকানারী। ভাওয়াইয়া গানে প্রেমের সেই অনির্বাণ রূপমাধুরী ধরা পড়েছে। এইসব গানগুলি যেমন Pastoral Song বা শ্রমজীবী যাযাবর মানুষদের গান, তেমনই তাদের প্রেমও pastoral. নারীর কণ্ঠে ঝরে পড়ে স্বর্গীয় আকুলতা। এখানে নাগরিক নারীর ছলনা-কৃত্রিমতা নেই। প্রেমের এমন আরক্ত প্রকাশ অন্য কোনও গানে তেমন পাওয়া যায়না। তাই এগুলি সর্বশ্রেষ্ঠ লোকায়ত প্রেমের গান-

যদি পিরীত মৈষাল করিতে চাও
ঘরোয়া পাছত্ মৈষাল বাতান দেও
চরণ ধর মৈষাল তমারে...

এই প্রেমিকার প্রেমে উথাল-পাথাল হৃদয়ের ভূমিকা। সে বলে, মৈষাল যেন তার বাড়ির পেছনেই বাথান করে। কিন্তু সে আর কতদিনের জন্য। মৈষাল তো চিরকালের জন্য থাকবে না এখানে। মোষ চরাতে চলে যাবে অন্য কোনওখানে। তার হৃদয় ভেঙে যায়। এগুলি সবই প্রেমের গান। প্রেমের গান অর্থে চিরন্তনকালের বিরহের গান—

ধিক্ ধিক্ ধিক্ মৈষাল রে—
মৈষাল ধিক তমার হিয়া
এ-হেন সুন্দরী নারী কারে যাইবেন দিয়া
মইষালরে।

এ-নারীর সান্ত্বনা নেই। পরপুষের সঙ্গে ঘরবাঁধারও স্বপ্ন নেই। শুধু জীবন্ত লতার ডগার মতো পরপুষের কাছে স্বেচ্ছাধীন আত্মসমর্পণ। যে ভেঙে-পড়াকণ্ঠে তার খেদ ঝরে পড়ে—

ধিকধিক ধিক মইষাল রে
(ও) মইষাল ধিক গাবুরালি

এ-হেন সুন্দরীক ছাড়ি
না যাং চাকিরি (মইষাল রে)
সে তাকে বোঝায় —
চাকিরি চাকিরি করেন মইষাল রে
ও মইষাল চাকিরি নোয় ভাল্
নলখাগেরার উড্ডার গুতায়
পিঠির যাবি ছাল।
আজি না দিস মইষাল গাও ত হাত (রে)
মইষাল ভাঙিবে মোর ছাপর খাটরে
মইষাল আউলাইবে মোর ঢালুয়া খোঁপা রে।
আজি বকনা মইষের দুধ ধরি
যান্ মইষাল আমার বাড়ি (রে)
মইষাল খাইয়া আইসেন মোর
নবীন বাটার পান রে।।

কী অসাধারণ আবেগ প্রকাশ পেয়েছে গানে। অলজ্জ প্রেমের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে এখানে। এ-পৃথিবীর প্রেমে স্বর্গের ইন্দ্রজাল নেই। বরংশরীরী প্রেমের ইঙ্গিত ফুটেছে আভাসে-ব্যঞ্জনায়। নারী বিষণ্ণ আক্ষেপে মইষালকে তার গায়ে হাত দিতে নিষেধ করে। তার সঙ্গে জোরাজুরিতে ছাপরখাট ভেঙে যেতে পারে মৈষালকে সাবধান করে দেয়। যে পরপুষ প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়ে চলে যাবে, সেই প্রেমাষ্পদের সঙ্গে মিলন-সম্পর্কে তার চি নেই। রাগের সঙ্গে জানিয়ে দিতে ভোলে না যে, এতে তার ঢিলে-করে-বাঁধা খোঁপা আলোল হয়ে যাবে। মৈষালবন্ধুকে আহ্বান জানিয়ে যৌবনবতী সেই নারী তাকে তার বাড়িতে গিয়ে "নবীন বাটার পান" খেয়ে আসবার অনুরোধ রাখে। এখানে নবীন বাটার পান অর্থে নবযৌবনের মধুকে বোঝানো হয়েছে।

কোথাকার কোন দেশ থেকে এসেছিল মৈষাল। সেই পরপুষে মন সমর্পণ করে সে তার ভালবাসার অর্ঘ্য প্রদান করে। আকুল প্রেমের তাগিদে সে তার নিজেকে বন্ধুর হাতে তুলে দেবার জন্য ব্যগ্র। তাই সে মৈষালকে তার বাড়ির পেছনেই বাথান তৈরি করতে বলে —
যদি পিরিত মৈষাল করিতে চাও
ঘরোয়া পাছত্ মৈষাল বাথান দেও।

আবার কম্পিতহিয়া নারী আকুলভাবে বলে ওঠে—
দ্যাশের মইষাল দ্যাশে যাবে
ও মোর মনটাই অবে বান্দা
আঁটিয়া কেলায় কেলায় না কং
বিচি ঘস্ঘস্ করে
পরপুষ বা পুষ না কঁও
হিয়া জরজর করে।

গানে সেই চিরযৌবনার বেদনার আর্তি ঝরে পড়ে। প্রেমের বেদনায় দগ্ধ হয় সে। একান্ত আকুল কণ্ঠে বিরহখিন্না নারী বলে—
আজি ছাড়িয়া না যাং চ্যাংরা মইষাল রে।
মইষের পিটিৎ চড়িয়া মৈষাল
ছিঁড়েন কাশিয়ার ফুল
আষাঢ়ো শ্রাবণমাসে নদী

হুলাস্থূল রে।
ভরা নদীর জল ছলছল করে উঠছে। নারীরও ভরা যৌবন। প্রেমে পরিপূর্ণ হৃদয় নিয়ে সে মইষালের কাছে আবেদন জানায়—
আজি ছাড়িয়া না যান চ্যাংরা মইষাল রে।
দুধ খোয়াইলেন সেরে-সেরে
দই খাওয়াইলেন ভারে
তমরা মইষাল ছাড়িয়া গেইলে
গাভুর বয়সে আড়ি রে।
কোনও গানে পাই নারীর আশংকা-উদ্বেল হৃদয়ের চিত্র। মইষালের জন্য ঘরের কাজে মন বসে না তার। মোষের পিঠে চড়ে মইষাল গেছে নদীর চরে। নারীর মন বিধুর হয় চিন্তায়। সে কানপাতে বাতাসে। পরপুষের জন্য উন্মুখ চিত্ত সে মোষের গলার ঘন্টির শব্দও শুনতে পায় না।
মইষ চরান্ মোর মৈষাল বন্ধু
গামছা মাথায় দিয়া
ওরে, মোর নারীটার মনটায় কয়
মুই প ধরং যায়্যারে।
'প' অর্থে মোষের বাচ্চা ধরার বাসনা আসলে মৈষালের কাছে যাওয়ার আকাঙক্ষা ছাড়া কিছু নয়। বাথানকে শত্রু মনে করে নারীর হৃদয় ক্ষিপ্ত হয়—
আকারি চাউলের ভাত, মৈষাল রে
মৈষাল, বক্না মৈষের দুধ
তুই মৈষাল বাথানত্ থাকিস
আমার জ্বলে বুক, মৈষাল রে।
বিরহে জ্বলে বুক। শরীরও জ্বলে প্রেমিকের সঙ্গে মিলনের আকাঙক্ষায়। দেহ-মিলনের উদগ্র বাসনায় অস্থির হয়ে ওঠে হৃদয়। এখানে অলজ্জ প্রেমের রক্তিম ছটা—
ও কি ও মৈষাল রে
ফুলো ফুটিল মানববৃক্ষে
ভমর বিনা ফুলের মধুরে মৈষাল
ফুলেতে শুকাবে।
ওরে মানবকুলের ভমর তুই
ভমর বিনা ফুলের মধুরে মৈষাল
কায় বসি খাবে।
অজানা লোককবির গানে দেখি, শরীরবৃক্ষে ফুল ফুটেছে। ভ্রমরহীন ফুলের গতি কী? কে খাবে মধু?
এইসব গানের সঙ্গে মাহুতবন্ধুর গানও পাওয়া যায়। সর্বদাই যে পরপুষের জন্য আকুলা নারীর দেহকামনা বা হৃদয়বেদনা এগুলিতে সুর হয়ে প্রকাশ পায়, তা নয়। নিজের যৌবনবেদনায় উত্তাল নারীর জলপাইগুড়ি-কোচবিহারে মৈষালবন্ধুর গানে মৈষাল রূপ নায়ককে পাই, মাহুতবন্ধুর গানেও তেমনই পাই বিবাহিত স্বামীরূপে। জীবিকার তাগিদে সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে রেখে হাতির পিঠে চড়ে মাহুতস্বামী যায় শিকারসন্ধানে। অরণ্যময় হিংস্র পরিবেশে এইসব মাহুতদের কাটাতে হয় হাতির খেদার দলে। বিয়া গানে বা মাহুত বন্ধুর গানে তাই নারীর বেদনা ঝংকৃত হয়। বিরহখিন্না নারীদের স্বামীর পরবাসযন্ত্রণা সহ্য হয় না, সে-বেদনাও ফুটে উঠেছে ভাওয়াইয়ার গানে। আবার যে-সব নারীর স্বামী নিজেই মৈষাল হয়ে জীবিকার সন্ধানে অনিশ্চিত জীবনের পথে ছুটেছে, যে-সব নারীর স্বামী হাতি-ধরার কাজে জঙ্গলে ছুটে গিয়েছে, যে-সব নারীর স্বামী মনিবের গর গাড়ির গাড়োয়ান (গাড়িয়াল) হয়ে পথে-পথে জীবন কাটায়, তাদের যুবতী স্ত্রীদের বেদনা সহজেই

ঝংকৃত হতে দেখা যায় ভাওয়াইয়ার গানে।
যেদিন মাহুত শিকারে যায়
নারীর মন মোর ঝুরিয়া রয় রে।
বালু টি-টি পাখিরে কান্দে বালুতে পড়িয়া
আর গৌরীপুরিয়া মাহুত কান্দে ও
সখি, ঘরবাড়ি ছাড়িয়া, সখিও
মোর, দান্তাল হাতির মাহুত রে
দ্যাশেতে মাহুত ছাড়িয়া যায়
নারীর মন মোর কান্দিয়া রয় রে।
কোনও গানে শুনি মাহুতকে দেখে পরকীয়া নারীর আকাঙক্ষা—
হাতির পিটিৎ থাকিয়া রে মাহুত
থোরো কলা ভাঙো মাহুত রে
নারীর মনের কাথা তমরা কি বা জানোরে।
তার বেদনা সোজাসুজিভাবে প্রকাশিত হয় কোনও গানে—
যে-নারীর পুষ নাই ও
ও তার রূপে কি কাম করে, সখিও
মোর, সারীন হাতির মাহুতরে
দ্যাশের মাহুত ছাড়িয়া যায়
নারীর মন মোর কান্দিয়া রয় রে।
মাহুতের প্রেমের বেদনা দেখি একটি গানে—
আই ছাড়িলং, ভাই ছাড়িলং ছাড়িলং সোনার পুরী
বিয়াও করেয়া ছাড়িয়া আসিলং ও
সখি, অল্প বয়সের নারী .....
লক্ষ করবার বিষয় ভাওয়াইয়ার গানগুলিতে বিবাহিতা নারী পুষের প্রেমে বিরহব্যঞ্জনা যেমন আছে, তেমনই পরপুষের সঙ্গে প্রেমের ব্যঞ্জনাও আছে। মাহুতের প্রেমে বিদেশিনি প্রেমিকার আকুতির উদ্ধৃতি রেখেছেন এ-গানের শ্রেষ্ঠ গবেষক ড. সুখবিলাস বর্মা—
গঙ্গাধরের পারে পারে রে, ও মোর মাউতে চরায় হাতি
কি মায়া নাগাইলেন মাহুতরে।
গাড়িয়ালের গানেও এই প্রেম, এই বিরহের বেদনা। তার সঙ্গেও মিশে রয়েছে শরীরী বাসনা। দেহই প্রেমের যজ্ঞবেদি। এই যজ্ঞবেদি ছাড়া স্ত্রীপুষের মিলন অসম্পূর্ণ থাকে। ভাওয়াইয়া গানের শিল্পীরা বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তা জেনেছেন। এইসব গানে নারীর কণ কণ্ঠে নদীর স্রোতও উজানে বয়ে যায়, পথের ধুলোয় জাগে রোমাঞ্চ—
যেদিন গাড়িয়াল উজান যায়
নারীর মন মোর ঝুরিয়া রয় রে
কোনও গানে শুনি—
তোরে ছাড়িয়া রইতে পারি না রে
ওরে গাড়িয়াল বন্ধুরে
গাড়ির চাকায় পড়িয়া গাইল....
বিশাল প্রাকৃতিক পটভূমিকে সাক্ষী রেখে এইসব গানগুলি গড়ে উঠেছে। শরীরকে বাদ দিয়ে প্রেম-প্রণয়ের আরতিবন্দনা কৃত্রিম শিল্পকলামাত্র। তিস্তা-তোর্সার চর, চিলামারির বন্দর, গদাধরের তীরবর্তী আলুয়া-কাশিয়ার বন, গোয়ালপাড়ার

জঙ্গল বা অরণ্যের যে-বিশাল পটভূমি, তাতে এই প্রেম-প্রণয় উচচারিত হয়েছে গভীর আবেগের সুরে। অনেকে এগুলির মধ্যে বৈষ্ণবপদাবলির রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের প্রভাব দেখেছেন। উত্তরবাংলার এ সব অঞ্চলে বাংলার বৈষ্ণবপদাবলির প্রভাব বেশি থাকার কথা নয়। আসলে লোকায়ত জীবনের প্রাণবন্যাই অসংকোচ প্রকাশের সাহসে এগুলিকে কাব্যহিসাবে অনুপম করে তুলেছে। উদ্ভিন্নযৌবনা নারী এই সব গানে নিজ হৃদয়ের অপূর্ণবেদনা প্রকাশে যেমন সরল, তেমনই অ ান্তরিক। এক বিয়ের উপযুক্তা কন্যা বাবা তার বিবাহ দিচ্ছে না বলে তার দিদিমার কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করছে। তার সমবয়সীদের সকলেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তারা সবাই বাড়ির উঠোন দিয়ে যাতায়াত করে। এ-দৃশ্য নারীর যৌবনবেদন াকে বহিমান করে তুলেছে। এখন আর তার কিছু ভাল লাগছে না। বাপের বাড়ির খাদ্যের স্বাদ ভাল লাগছে না।

আবো দেখত মোর বাপের কাথা মোর বুলে না দেয় বিয়া,
মুই বুলে গাবুর হংকে নাই।
আবোগে গাবোর কাল উচ যাইয়া মুখ না ফাটে, ফাটে হিয়া।

কোনও গানে শুনি উদ্ভিন্নযৌবনা কন্যা প্রণয়াসক্ত হয়ে কোনও প্রণয়ী সম্পর্কে বলছে। তার বাড়ির পাশে বাঁশবনের আড় ালে সেই প্রেমিক মোষ নিয়ে হালচাষ করছে—

ও মোর কালারে ও মোর কালারে
বাড়ির পছিম দিয়ে বাঁশের আওডাল।
সে দি কালা জুড়িছে মইষের হাল।

বিধবার প্রেমের আকাঙক্ষাও ভাওয়াইয়ার গানে সুর ধরেছে। এখানে কোনও ছলনা বা বিধিনিষেধের কৃত্রিমতা প্রাধান্যল াভ করেনি। একে অসামাজিক কলঙ্কযুক্ত প্রেম বলা যাবে না। দেহকে অভুক্ত রেখে এ-জীবন ব্যর্থ হতে দিতে চায় না নারী। ত ার শরীরে ভরা যৌবন। বোষ্টমবাদিয়াকে কামনাজর্জর গানে আহ্বান ধবনিত হয়—

অল্প বয়সে মোর স্বামীটা গেইছে মরিয়া
তুই মোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর বৈষ্টম বাদিয়ারে।

বৈধব্যযন্ত্রণা সইতে পারছে না নারী। উপযুক্ত বয়সে পুষ বিহনে দগ্ধ হচ্ছে দেহ-মন। এইসব চিটুল বিদুয়ার দুঃখ উথলে উঠেছে গানে। কুরা-পাখিকে সম্বোধনে গান—

নদীর পারের কুয়ারে মোর জামের গাছের শুয়া
আজি কেনে কান্দেন অমন করি চৌখের জল ফ্যালেয়ারে
কোরারে মুইও কান্দোং চিটুল বিদুয়া হয়া
ওরে ঢাল কাউয়ার কান্দন শুনি মনের আগুন জ্বলে

কোনও গানে শুনি—

ওকি পতিধন প্রাণ বাঁচেনা যৈবন জ্বালায় মরি
খোঁপোতে নাইরে কবুতর কি করে তার খোঁপে।

এইসব গানগুলির মধ্যে যে-অকৃত্রিমতা আছে, যে-জীবননিষ্ঠা আছে, যে-আন্তরিকতা আছে, লোকসাহিত্যের মধ্যে তা প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হয়ে যাই। হৃদয়প্রান্ত ছাপিয়ে যে-প্রেম আসে, তা কোনও জাতিকুল মানে না। সর্বোপরি, উপবাসী দেহ-মন থরে-থরে নিজেকে সাজিয়ে তোলে, সর্বসমর্পণের মধ্যে জীবসত্তার আস্বাদন ঘটাতে চায়। সে সমাজ-সংসার মানে না। ভাইয়ের দেশ ত্যাগ করে চলে যেতে চায়—ছাড়নু ভায়ের দ্যাশরে।

পতিপত্নীর প্রেমও অনেক ভাওয়াইয়া গানের বিষয় হয়েছে। গাড়িয়াল স্বামীর জীবনের দুঃখকষ্ট সে জানে। জীবিকার জন্য তার কঠোর পরিশ্রম। নারীর গানে বেজে ওঠে বিনিদ্র দিনরাত্রি যাপনের গান—

কতয় রব আমি পন্থের দিকে চায়া রে
যেদিন গাড়িয়াল উজান যায়
নারীর মন মোর ঝুরিয়া রয়রে ....

আবার, বিপদসঙ্কুল জঙ্গলে দাঁতাল হাতির সামনে মাহুত স্বামীর জন্য আশংকাও তাকে বিচলিত করে। যতদিন স্বামী ঘরে ন

া ফিরে আসে, ততদিন সে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় অস্থির—
আকাশেতে নাইরে চন্দ্র কি করে তোর তারা
যেবা নারীর পুষ নাইরে ও তার দিন অন্ধিয়ারা।
বৈষ্ণবপদাবলিতে পরপুষের প্রেমে বিচলিত রাধার অভিসার পেয়েছি ''ঘনঘন ঝনঝন বজর নিপাত'' - ভরা রাতে, ভাওয়াইয়ার নারীও ঘরে থাকতে না চেয়ে বেরিয়ে পড়তে উন্মুখ তার পুষ-সন্ধানে—
হাঙ্গর কুমীর বন্ধু হামাক কিসের ভয়
সান্তারিয়া দরিয়া হব পার।
কৃষ্ণের জন্য সর্বস্ব সমর্পণের পরেও যখন সে-প্রেমিক তারই আঙিনা দিয়া অন্য নারীর সঙ্গে মিলতে যায়, তখন রাধার বেদনার মতো ভাওয়াইয়ার নারীকেও আক্ষেপে বিদ্ধ হতে শুনি—
কিসের মোর রান্ধন কিসের মোর বাড়ন
কিসের মোর হলদিবাটা
মোর প্রাণনাথ অন্যের বাড়ি যায়
মোরে আঙিনা দিয়া ঘাটা।
ভাওয়াইয়ার এক বিরাট অংশই জুড়ে আছে পরকীয়া প্রেম। পরপুষের প্রেমে এই নারী জর্জর। এই স্বাধীনা রমণী প্রেমকেই তার সর্বস্ব বলে মনে করে। দেহের আরতিবন্দনায় শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য-উপচার সাজিয়ে সেই প্রেমিককে পাবার জন্য সর্ব ভয়-বন্ধন অস্বীকার করে সে। প্রেমের দুর্জয় শক্তি সেই নারীসত্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য।
ভাওয়াইয়ার এই গানটি লক্ষ করা যাক। ভাওয়াইয়ার এক বিশেষ শ্রেণীর গানকে বলা হয় চট্‌কা। এই গানে চটুল ও চপল সুরের দোলা লাগে। গানের ভাষাও হয় তেমনই।
আই মোর পায়ে বা ঘুংরা বাজেরে
আই মুই কেমনে বাইরা যাং
ঘরে মোর শ্বশুর আগদুয়ারে ভাসুর
ও মোর শিয়রে ননদী জাগে
আই মুই পিরীতির আগে পিরীতিরও বাদে
ও ঘুংগুরার বায়না দিনু
আরে না জানিয়া রসিয়া বানিয়া
কালাই বা ওরেয়া দিছে রে।
ও মুই ঠাসিয়া ধরং চিপিয়া ধরং
ও আস্তে ফেলাওং পাওরে।
পরকীয়া প্রেমে ঘর ভাঙতে চায় নারী। এখানে যেন বৈষ্ণব পদাবলির রাধাকৃষ্ণলীলার ভাবানুষঙ্গ আছে
মন মোর কারিয়া নিল বন্ধুয়া রে
মন কারিয়া নিলুরে মোর তোর ভাওয়াইয়া গান
তোর না গানের সুরে পাগল করল মনরে
মন কারিয়া নিলুরে মোর বন্ধু সোনার চান
তোর না পিরিতে বন্ধ ঘরত না রয় মনরে।
চিতান ভাওয়াইয়ার দৃষ্টান্তটি দেখা যাক। বিচ্ছেদের ব্যথায় কাতর ক্রন্দনের গান। অস্থায়ীতে আরম্ভ হয়ে এই গান উচচগ্রাম থেকে ক্রমেই নিম্নগ্রামে যায়। ''বৈদ''-অর্থে কিশোর চ্যাংরাকে সম্বোধন করে পরকীয়া নারী বলে—
(আজি) নদী না যাইওরে বৈদ
নদী না যাইওরে (বৈদ) নদীর ঘোলাপানি।
আজি নদীর বদলেরে (বৈদ) বাড়িতে ধোন্ গাওরে (বৈদ)

মুই নারী তুলিয়া দিব পানি।
গানে দেখি, এক লোটা দুই লোটা জল তুলে দিতে না-দিতেই যুবতীর—"খসিয়া পড়িল মোর গালার চন্দ্রমালা
বাপনাই মোর ভাবিবেরে (বৈদ) মাও নাই মোর কান্দিবেরে (বৈদ)
ভাইও নাই যে তুলিয়ারে দিবে মালা।
তোর্সা নদীর পারে রে (বৈদ) রাজহংসা পঙ্খী পড়েরে (বৈদ)
পঙ্খীর গালায় গজমোতি মালা।
রাজহংসার কান্দনেরে (বৈদ) বাড়িঘর মোর না-জাগে মনেরে (বৈদ)
মনটা মোর উড়াও-বাইরাও করে।
প্রবন্ধ ক্রমশ দীর্ঘ হয়ে আসছে। কিন্তু এর কাব্যসৌন্দর্যের আবেদন এমন যে, গানের পংক্তির পর পংক্তি তুলে ধরতে ইচ্ছে করে। নীচের গানটি দেখুন, অবৈধ প্রেমের কী সুন্দর বৈচিত্র্যই না ফুটেছে!
নায়ক। তমার বাড়ি আসিলাম কন্যা
তমরা নাই ঘরে
তমার বাড়ি খেকি ভুটি খেই-খেই করে।
নায়িকা। কুকুরজাতি নেলজ জাতি
ডাঙ্গেয়া ভাঙ্গিখ ঠ্যাং
দুঃখে আসুক সুখে আসুক
কিসের ঝাং ঝাং।
কুকুর। চোর চোর বলিয়া করিলাং ঝাং ঝাং
কায় জানে তায় গিথ্যানীর বেটির নাং।
নির্জনবাড়িতে প্রেমিকার কাছে এসেছে অবৈধ প্রেমিক। কুকুর ঘেউ-ঘেউ করেছে বলে নায়কটির অভিযোগের উত্তরে নারী স্বীকার করেছে কুকুরজাতি এখন নির্লজ্জই বটে। সে প্রেমিককে ভরসা দেয় যে পিটিয়ে কুকুরের ঠ্যাং ভেঙে দেবে। তার এত ঝাং ঝাং করার কী প্রয়োজন? উত্তরে কুকুর বলে, চোর ভেবে সে ঝাং ঝাং করেছে। সে কী করে জানবে যে, তার প্রভুপত্নীর কন্যার উপপতি এসেছে বাড়িতে?
গানে বৈচিত্র সৃষ্টি করেছে নতুন ধরনের পরকীয়া আবেগ। স্বামীর চাইতে তার পছন্দ দেবরকে। এ পরকীয়া প্রেমের আর এক নিদর্শন। দেবরকে কেন্দ্র করে বৌদির মনে নিষিদ্ধ প্রেমের জোয়ার। ছলাকলাই প্রেমের আদিমতম উপাদান। দেবরের দিকে সে চোরা দৃষ্টিতে তাকায়। তার দৃষ্টিতে জাগে ইশারা। —
ভাসুরশ্বশুরের মাছ রান্ধোং মুই ঝোলেয়া করিয়া
ভাবের দেওরার মাছ রান্ধোং মুই তৈলোতে ভাজিয়া।
সে ভাবের দেওরকে নিষিদ্ধ সম্পর্কে বেঁধেই খুশি হয় না। তার নিজের স্বামীকে সে বলে ঘাটের মড়া। প্রেমের মর্ম কিছুই জানে না স্বামী।
ভাবের দেওরাকে খাবার ডাকোং চৌকের ইশারা দিয়া
পানিয়া মরাক খাবার ডাকোং নাটির গুটা দিয়া রে।
চোখের ইশারায় নবযুবতী ভাবী ডাকবে দেওরকে। আর "পানিয়া মরা" অর্থে ঘাটের মড়াকে খেতে ডাকবে "নাটির গুটা" অর্থে লাঠির গুঁতো দিয়ে।
দেশবিভাগপূর্ব বাংলার রংপুর জেলা, দিনাজপুর জেলার কিছু অংশ, আসামের গোয়ালপাড়া ও ধুবড়ি জেলা ছাড়াও বর্তমান উত্তরবাংলার কোচবিহার-জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং জেলার সমভূমি অঞ্চল জুড়েই এই অঞ্চলের কথোপকথনের ভাষা রাজবংশী বা কামরূপীতে গীত সঙ্গীত ধারাই ভাওয়াইয়া নামে পরিচিত। নানা অনুষ্ঠানে, সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবে, বিবাহে এই গানগুলি যেমন গীত হয়ে আসছে দীর্ঘদিন, তেমনই প্রেমগীত-বাৎসল্য বা বিরহ-মিলনেরও এই গান। ছয়ের দশকের আগে পর্যন্ত বিশ শতকের সবটা জুড়ে এই ভাওয়াইয়া চটকার গানগুলি লোকের মুখে মুখে চলে

এসেছে বলে ড. বর্মা মনে করেছেন, সংগ্রহ তার অনেক পরের। পরবর্তীকালে অল্পসংখ্যক কেউ-কেউ এই গান লিখেছেন বটে, কিন্তু অজানিত কাল ধরে মুখে মুখে রচিত এই গানগুলি অসাধারণ কাব্যসম্পদে সমৃদ্ধ। প্রবন্ধের উপসংহারে নীচের গানটির দিকে পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। মঙ্গলকাব্যে আমরা বারোমাস্যার গান পেয়েছি। এই শ্রেণীর গান রাজবংশী বাঙালিদের রচিত ভাওয়াইয়া গানেও আমরা পাই। এক সময় ব্যাপক প্রচলিত ছিল রাজবংশী বারোমাসি গীত। শান্তি বারোমাসি পিয়া বারোমাসি, নাগা বারোমাসি নামে পরিচিত ছিল এই গান। প্রোষিতভর্তৃকার বিরহবেদনার এই গান মঙ্গলকাব্যের নারীদের বারোমাস্যা স্মরণ করিয়ে দেয়—

কত পাষাণ বাইন্ধাছ পতি মনেতে
সুখের সময় পতি রইলেন বৈদ্যাশে
জ্যৈষ্ঠমাসে মিষ্টিফল
আষাঢ়মাসে নতুন জল
শ্রাবণমাসে গেল কন্যার কান্দিতে-কাটিতে
ভাদ্রমাসে আউলা কেশ
আশ্বিন মাসে বর্ষা শেষ
কার্তিক মাস গেল কন্যার ভাবিতে-চিন্তিতে
আঘন মাসে পাকে ধান
পৌষমাসে শীতের বান
মাঘমাস গেল কন্যার ভিজাইতে শুকাইতে
ফাগুন মাসের তিগুণ জ্বালা
চৈত্রে নারীর বরণ কালা
বৈশাখ মাস গেল কন্যার উঠিতে আর বসিতে।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com